بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মোতাবেক ১৫ তবলীগ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ যেসব সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হবে তাদের মাঝে প্রথম নাম হল, হযরত খালেদ বিন কায়েস (রা.)। তিনি খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু বায়াযাহ্'র সদস্য ছিলেন। তার পিতা ছিলেন কায়েস বিন মালেক আর মায়ের নাম ছিল সালামা বিনতে হারেসাহ্। তার স্ত্রী ছিলেন উম্মে রবী' যার ঘরে (তার) এক পুত্র ছিলেন আব্দুর রহমান। ইবনে ইসহাক এর মতে তিনি সত্তর জন আনসারী সাহাবীর সাথে আকাবার বয়আতে অংশ নেন। হযরত খালেদ (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯-৪৪৫, খালেদ বিন কায়েস (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন, হযরত হারেস বিন খাযামাহ্ আনসারী (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু বিশর। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। বনু আব্দিল আশহাল-এর মিত্র ছিলেন। হযরত হারেস বিন খাযামাহ্ (রা.) বদর, উহুদ, খন্দক এবং অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন খাযামাহ্ ও হযরত ইয়াস বিন বুকায়ের (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়, তাবূক-এর যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর উটনী হারিয়ে গেলে মুনাফিকরা মহানবী (সা.)-এর ওপর এই আপত্তি করে যে, যিনি নিজের উটনীর খবরই জানেন না তিনি ঊর্ধ্বলোকের সংবাদ কীভাবে জানতে পারেন? মহানবী (সা.) এ বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, আমি সেসব বিষয়ই জানি যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবহিত করেন। এরপর তিনি (সা.) আরো বলেন, **'এখন খোদা তা'লা আমাকে উটনী সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, তা উপত্যকার অমুক ঘাঁটি বা স্থানে রয়েছে'**। এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে পূর্বেও এ ঘটনার কিছুটা উল্লেখ হয়েছে। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশিত স্থান থেকে যে সাহাবী উটনীটি খুঁজে আনেন, তিনি ছিলেন হযরত হারেস বিন খাযামাহ্ (রা.)। হযরত আলী (রা.)'র খিলাফতকালে ৪০ হিজরী সনে ৬৭ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। **{উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০২-৬০৩, আল্ হারেস বিন খাযামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৬, আল্ হারেস বিন খাযামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত খুনায়েস বিন হুযাফাহ্ (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু হুযাফাহ্। তার মায়ের নাম ছিল যঈফাহ্ বিনতে হিযইয়াম। তিনি বনি সাহমি বিন আমর গোত্রের সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত খুনায়েস (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফাহ্'র ভাই ছিলেন। হযরত খুনায়েস (রা.) সেসব মুসলমানের একজন ছিলেন যারা দ্বিতীয় বার হাবশা বা ইথিওপিয়া অভিমুখে হিজরত করেন। হযরত খুনায়েস (রা.) প্রাথমিক মুহাজিরদের মাঝে গণ্য হন। হযরত খুনায়েস (রা.) মদীনায় হিজরত করার পর হযরত রিফা' বিন আব্দিল মুনযের-এর কাছে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত খুনায়েস এবং হযরত

আবু আবস্ বিন জাবর (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত খুনায়েস (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাহ্ মহানবী (সা.)-এর পূর্বে হযরত খুনায়েস (রা.)'র স্ত্রী ছিলেন বা তাদের বিয়ে হয়েছিল। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০০, খুনায়েস বিন হুযাফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৮, খুনায়েস বিন হুযাফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}**

সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এর বিবরণে লিখা হয়েছে,

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র একজন দুহিতা ছিলেন হাফসাহ্ (রা.)। তিনি নিষ্ঠাবান সাহাবী খুনায়েস বিন হুযাফাহ্ (রা.)'র স্ত্রী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে আসার পর খুনায়েস (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি এই অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি বরং কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত হাফসাহ্ (রা.)'র দ্বিতীয় বিয়ের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তখন হযরত হাফসাহ্ (রা.)'র বয়স বিশ বছরের বেশি ছিল। হযরত উমর (রা.) নিজ প্রকৃতিগত সরলতায় নিজেই উসমান বিন আফফান (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, আমার কন্যা হাফসাহ্ বিধবা, আপনি চাইলে তাকে বিয়ে করুন কিন্তু হযরত উসমান (রা.) অসম্মতি জানান। এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে বিয়ের কথা বলেন, আপনি তাকে বিয়ে করুন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)ও নীরবতা পালন করেন, কোন উত্তর দেন নি। এতে হযরত উমর (রা.) খুবই বিষণ্ন হন এবং দুঃখ পান। তিনি এই মনোকষ্ট নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে এই পুরো বিষয়টি বর্ণনা করেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! কোন চিন্তা করো না, আল্লাহ্ চাইলে হাফসাহ্ উসমান এবং আবু বকরের চেয়েও উত্তম স্বামী পাবে, আর উসমান হাফসাহ্র চেয়ে উত্তম স্ত্রী লাভ করবে। মহানবী (সা.) এই কথা এজন্য বলেছিলেন কেননা, তিনি হাফসাহ্কে বিয়ে করার এবং নিজ দুহিতা উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)'র সাথে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা সম্পর্কে হযরত আবু বকর এবং হযরত উসমান (রা.) উভয়ে অবহিত ছিলেন, অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয়েছিল। আর এ কারণেই তারা হযরত উমর (রা.)'র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)'র সাথে তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেন, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এরপর তিনি (সা.) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে হযরত উমর (রা.)'র কাছে হাফসাহ্র জন্য প্রস্তাব পাঠান। হযরত উমর (রা.) এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারতেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন আর তৃতীয় হিজরী সনের শাবান মাসে হযরত হাফসাহ্ মহানবী (সা.)-এর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হন। এই বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমার কারণে হয়ত আপনি বিমর্ষচিত্ত হয়েছেন এবং মনোকষ্ট পেয়েছেন। আসল কথা হল, আমি মহানবী (সা.)-এর অভিপ্রায়ের কথা জানতাম, কিন্তু আমি তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর মনের কথা প্রকাশ করতে পারতাম না। তবে হ্যাঁ, যদি তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর এই বিয়ের সংকল্প না থাকতো, তাহলে আমি সানন্দে হাফসাহ্কে বিয়ে করতাম।

হাফসাহ্ (রা.)'র বিয়ের পেছনে একটি বিশেষ প্রজ্ঞা এটি ছিল যে, তিনি হযরত উমর (রা.)'র কন্যা ছিলেন, যাকে হযরত আবু বকর (রা.)'র পর সকল সাহাবীর মাঝে সর্বোত্তম জ্ঞান করা হতো, আর মহানবী (সা.)-এর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন ছিলেন। অতএব, পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করা এবং হযরত উমর (রা.) ও হাফসাহ্ (রা.)'র এই

মর্মযাতনা দূর করার জন্য, যা খুনায়েস বিন হুযাফাহ্ (রা.)'র অকালমৃত্যুতে তাদের হয়েছিল, (তাই) মহানবী (সা.) স্বয়ং হাফসাহ্কে বিয়ে করা সমীচিন মনে করেন। **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮)**

এক বর্ণনা অনুসারে হযরত খুনায়েস বিন হুযাফাহ্ (রা.) উহুদের যুদ্ধে আহত হন। পরবর্তীতে সেই আঘাতের কারণেই মদীনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মহানবী (সা.) তার জানাযা পড়ান এবং তাকে হযরত উসমান বিন মাযঊন (রা.)'র পাশে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়। **{ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৫২, খুনায়েস বিন হুযাফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল জলীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত}, {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০০, খুনায়েস বিন হুযাফাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী যে সাহাবী স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হল, হযরত হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্। হযরত হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.) আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি মহান সাহাবীদের একজন ছিলেন। হযরত হারেসাহ্ (রা.)'র মায়ের নাম ছিল জা'দা বিনতে উবায়েদ। তার সন্তানসন্ততির মাঝে আব্দুল্লাহ্, আব্দুর রহমান, সওদাহ্, উমরাহ্ এবং উম্মে হিশাম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সন্তানদের মায়ের নাম ছিল উম্মে খালেদ। তার অন্যান্য সন্তানসন্ততির মাঝে রয়েছে উম্মে কুলসুম, যার 'মা' বনু আব্দুল্লাহ্ বিন গাতফান গোত্রের সদস্যা ছিলেন। আর ছিলেন আমাতুল্লাহ্, যার 'মা' বনু জুনদু'র সদস্যা ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে, হারেসাহ্ বিন নু'মান মহানবী (সা.) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন তাঁর কাছে জিবরাঈল উপবিষ্ট ছিলেন। পূর্বে আরেকটি সংক্ষিপ্ত রেওয়ায়েতে এভাবে ছিল, তিনি (রা.) যাচ্ছিলেন তখন মহানবী সালাম বললে জিবরাঈল (আ.) ওয়া আলাইকুম আস্সালাম বলেন। কিন্তু বিশদ বিবরণ সংবলিত রেওয়ায়েত হল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হারেসাহ্ বিন নু'মান মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন তাঁর কাছে জিবরাঈল (আ.) উপবিষ্ট ছিলেন আর তিনি (সা.) তার সাথে ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন। হারেসাহ্ (রা.) তাঁকে (সা.) সালাম করেন নি। জিবরাঈল (আ.) জিজ্ঞেস করেন, তিনি সালাম করেন নি কেন? মহানবী (সা.) পরে হারেসাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি যখন যাচ্ছিলে, তখন সালাম কর নি কেন? তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আমি আপনার কাছে এক ব্যক্তিকে দেখেছি, আপনি তার সাথে ক্ষীণ স্বরে কথা বলছিলেন। আমি আপনার কথার মাঝখানে কথা বলা পছন্দ করি নি, অর্থাৎ সালাম করে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা পছন্দ করি নি। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, যে আমার কাছে বসেছিল তুমি কি তাকে দেখেছ? তিনি বলেন, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আ.)। আর (আ.) বলছিলেন, এই ব্যক্তি যদি সালাম করতো তাহলে আমি তাকে উত্তর দিতাম। এরপর জিবরাঈল (রা.) বলেন, **ইনি আশিজন মানুষের অন্তর্ভুক্ত**। মহানবী (সা.) বলেন, আমি জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করি, এর অর্থ কি? তখন জিবরাঈল (আ.) বলেন, তিনি সেই আশিজনের একজন যারা হুনায়েন এর যুদ্ধে আপনার সাথে অবিচল ছিল। জান্নাতে তাদের এবং তাদের সন্তানসন্ততির রিয্ক এর দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লার হাতে। অতএব, তিনি (সা.) হারেসাহ্ (রা.)র কাছে এসব কিছু বর্ণনা করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তার সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রা.)-ই রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি (রা.) তার

মায়ের সঙ্গে সর্বোত্তম ব্যবহার করতেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের সবারই এরূপ পুণ্যকর্ম করা উচিত।

হযরত হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.) শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি তার নামাযের স্থান থেকে নিজ কক্ষের দরজা পর্যন্ত লম্বা একটি রশি বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি নিজের কাছে একটি ঝুড়ি রাখতেন, যাতে খেজুর থাকতো। যখন তার কাছে কোন মিসকীন বা ভিক্ষুক আসতো বা কেউ সালাম করতো বা কোন অভাবী আসতো, তাকে দরিদ্র মনে হলে সেই রশি ধরে ধরে তিনি নামাযের জায়গা থেকে দরজা পর্যন্ত আসতেন এবং তাকে খেজুর দিতেন। তার পরিবারের সদস্যরা বলতো, আমরা আপনার পক্ষ থেকে এই সেবামূলক কাজ সম্পাদন করি, আমরা দিয়ে দেই। আপনি দেখতে পান না, আপনি কেন কষ্ট করেন? কিন্তু তিনি (রা.) বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, **মিসকীনদের সাহায্য করা কষ্টদায়ক মৃত্যু থেকে মানুষকে রক্ষা করে**। রেওয়ায়েতে এসেছে, মদীনায় হযরত হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.)'র বাড়িঘর মহানবী (সা.)-এর বাড়ির নিকটে ছিল। তার অনেক বাড়িঘর ও সহায়-সম্পত্তি ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী হযরত হারেসাহ্ (রা.) তার নিজের বাড়িঘর মহানবী (সা.)-এর জন্য ছেড়ে দিতেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭১-৩৭২, হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}, {উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫৫-৬৫৬, হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}** অর্থাৎ বিয়ে বা অন্য কোন প্রয়োজনের নিরিখে বা যখনই আবাসনের প্রয়োজন হতো, তিনি স্থায়ীভাবে তা ছেড়ে দিতেন।

হযরত ফাতেমা (রা.)'র সাথে যখন হযরত আলী (রা.)'র বিয়ে হয়, তখন মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, নিজের বসবাসের জন্য কোন পৃথক ঘর সন্ধান কর। হযরত আলী (রা.) একটি ঘর খুঁজে বের করেন আর বিয়ে করে হযরত ফাতেমা (রা.)-কে সেখানে নিয়ে যান। এরপর মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বলেন, আমি তোমাকে আমার কাছে ডাকতে চাই অর্থাৎ আমার কাছে এসে যাও, (নিকটেই) কোন ঘর নাও। হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁকে পরামর্শ দেন অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আপনি হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.)-কে বলুন তিনি যেন অন্যত্র স্থানান্তরিত হন আর তার ঘরটি আমাদেরকে দিয়ে দেন। মহানবী (সা.) বলেন, হারেসাহ্ আমাদের জন্য বেশ কয়েকবার বাড়ি পরিবর্তন করেছে। তার বাড়ি আমার বাড়ির সন্নিকটবর্তী। আমার নিকটবর্তী যে ঘরই থাকে, তিনি তা আমার জন্য ছেড়ে দেন। এখন তাকে আবার স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য বলতে আমার লজ্জা হয়। এই সংবাদ হযরত হারেসাহ্ (রা.)'র কর্ণগোচর হলে তিনি সেই ঘর খালি করে অন্যত্র স্থানান্তরিত হন। আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি জানতে পেরেছি, আপনি ফাতেমা (রা.)-কে আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসতে চান। এটি আমার ঘর, আর বনু নাজ্জারের ঘরগুলোর মাঝে এটি আপনার সবচেয়ে নিকটে। আমি এবং আমার সম্পদ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের জন্যই নিবেদিত। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমার কাছ থেকে আপনার যে সম্পত্তি পছন্দ হয় তা গ্রহণ করুন। সেটি আমার কাছে সেই সম্পদের চেয়ে অধিকতর প্রিয় হবে যেটি আপনি গ্রহণ করবেন না। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি আশিস বর্ষণ করুন। অতএব মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমাকে হযরত হারেসাহ্ (রা.)'র গৃহে স্থানান্তরিত করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮-১৯, ফাতেমা (রা.) বিনতে রসূল (সা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

এর কিছুটা বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও লিখেছেন, তখন পর্যন্ত হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে মসজিদের কোন কক্ষে থাকতেন। কিন্তু বিয়ের পর কোন পৃথক ঘরের প্রয়োজন দেখা দেয় যাতে স্বামী স্ত্রী বসবাস করতে পারেন। এ কারণে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি কোন গৃহ খুঁজে বের কর যাতে তোমরা দু'জন থাকতে পারবে। হযরত আলী (রা.) সাময়িকভাবে একটি গৃহের ব্যবস্থা করেন। আর হযরত ফাতেমা (রা.)-কে সেই গৃহে নিয়ে যান। সেদিনই কনে বিদায়ের পর মহানবী (সা.) সেই গৃহে যান আর একটু পানি আনিয়ে তাতে দোয়া করেন। এরপর এই দোয়া পড়তে পড়তে সেই পানি হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমা (রা.)'র ওপর ছিটিয়ে দেন যে, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا نَسْلَهُمَا অর্থাৎ, **হে আমার আল্লাহ্! তুমি তাদের উভয়ের সম্পর্ককে আশিসমণ্ডিত কর আর তাদের সেই সম্পর্কে কল্যাণ দাও যা অন্যদের সাথে গড়ে উঠবে। আর তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আশিসমণ্ডিত কর।** অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কে, আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজের সাথে তাদের সম্পর্কে, তথা সবার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কল্যাণের দোয়া করেন। এছাড়া বলেন, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আশিসমণ্ডিত কর। এরপর তিনি সেই নবদম্পতিকে রেখে ফিরে আসেন। এরপর একদিন মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.)'র গৃহে গেলে তিনি মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করেন, হযরত হারেসাহ্ বিন নু'মান আনসারী (রা.)'র কাছে কয়েকটি ঘর আছে। আপনি তাকে কোন একটি ঘর খালি করে দিতে বলুন। তিনি (সা.) বলেন, তিনি আমাদের জন্য পূর্বেই এতবার ঘর ছেড়েছেন যে, এখন তাকে বলতে আমার লজ্জা লাগে। হারেসাহ্ (রা.) কোনভাবে একথা জানতে পেয়ে ছুটে আসেন আর মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যা কিছু আমার তা আপনারই। খোদার কসম! আপনি আমার কাছ থেকে যে জিনিসই গ্রহণ করেন, তা আমার কাছে রয়ে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আমাকে বেশি আনন্দ দেয়। এরপর সেই নিষ্ঠাবান সাহাবী জোরপূর্বক নিজের একটি ঘর খালি করে হস্তান্তর করেন। এরপর হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমা (রা.) সেখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। **(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৪৫৬)**

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মাঝে কে রাতের বেলা পাহারা দিবে? তখন হযরত হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.) ধীরে-সুস্থে দণ্ডায়মান হন। হযরত হারেসাহ্ (রা.) নিজের কোন কাজে তাড়াহুড়ো করতেন না। সাহাবীরা তার এত ধীরে-সুস্থে দাঁড়ানোর কারণে মহানবী (সা.)-কে বলেন, লজ্জাবোধ হারেসাহ্ (রা.)-কে নষ্ট করে দিয়েছে, এ সময়ে তার ত্বড়িৎ দাঁড়ানো উচিত ছিল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এমনটি বল না যে, লজ্জাবোধ হযরত হারেসাহ্কে নষ্ট করেছে বরং যদি তোমরা একথা বল যে, লজ্জাবোধ হযরত হারেসাহ্কে ভালো মানুষে পরিণত করেছে তাহলে তা সত্য হবে। **{আলমুনতাকা মিন কিতাবি মাকারিমিল আখলাক লিলখারাইতী, পৃঃ ৬৮, বাব ফযিলাতিল হায়া ওয়া জমীমে খাতারিহ্, হাদীস নংঃ ১২৭, দামেস্কর দারুল ফিকর থেকে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আমির মুয়াবিয়ার যুগে হযরত হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.) মৃত্যু করণ করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭২, হারেসাহ্ বিন নু'মান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

পরবর্তী সাহাবী হলেন হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু নু'মান। তার পিতা ছিলেন সা'দ বিন সা'লাবাহ্। তিনি হযরত সিমাক বিন সা'দ (রা.)'র ভাই ছিলেন এবং খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন। **{ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২, বশীর বিন সা'দ (রা.), বৈরুতের দারুল জলীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত}**

তার মায়ের নাম ছিল উনায়সাহ্ বিনতে খালীফাহ্ আর তার স্ত্রীর নাম হল, হামরাহ্ বিনতে রওয়াহা। হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) অজ্ঞতার যুগেও লিখতে জানতেন। এটি সেই যুগ ছিল যখন আরবে খুব কম সংখ্যক মানুষই লিখতে জানতো। আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে তিনি সত্তর জন আনসারী সাহাবীর সাথে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দকসহ বাকী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। মহানবী (সা.) সপ্তম হিজরীর শাবান মাসে হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)'র তত্ত্বাবধানে ত্রিশজনের সমন্বয়ে একটি যুদ্ধাভিযানে ফাদাক এ বনী মুর্‌রার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধও হয়। হযরত বশীর (রা.) একান্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ করতে গিয়ে তার গোড়ালিতে তরবারির আঘাত লাগে আর মনে করা হয় যে, তিনি শাহাদত বরণ করেছেন। তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেছেন বা শাহাদত বরণ করেছেন ভেবে শত্রুরা তাকে ফেলে চলে যায়। কিন্তু সন্ধ্যায় চেতনা ফিরে পেলে তিনি সেখান থেকে ফাদাক-এ চলে আসেন। ফাদাক-এ তিনি কয়েকদিন এক ইহুদীর বাড়িতে অবস্থান করেন। এরপর মদীনায় ফিরে আসেন। অনুরূপভাবে সপ্তম হিজরীর শওয়াল মাসে মহানবী (সা.) তাকে তিনশ' ব্যক্তির সাথে ইয়েমেন এবং জাবার অভিমুখে প্রেরণ করেন, যেটি ফাদাক এবং কারান উপত্যকার মাঝামাঝি অবস্থিত। এখানে গাতফান গোত্রের কিছু লোক উয়ায়নাহ্ বিন হিসন আলফারারী'র সাথে একত্রিত হয়। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো। তাদের মোকাবিলা করে হযরত বশীর (রা.) তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। মুসলমানরা তাদের কতককে বন্দি করে আর কতককে হত্যাও করে। আর গণিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসে। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০২-৪০৩, বশীর বিন সা'দ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

এরা সমবেত হতো যুদ্ধ ও ক্ষতি করার জন্য। এ জন্য মুসলমানদের নিরাপত্তার খাতিরে এসব পদক্ষেপ নেয়া হতো। ধনসম্পদ লুটপাট করা বা হত্যা করা উদ্দেশ্য ছিল না। যেমনটি গত খুতবায়ও আমি বলেছিলাম, একটি অন্যায় ও অযৌক্তিক আক্রমনের জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের প্রতি চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন যে, তোমরা কেন যুদ্ধ করেছ?

বশীর বিন সা'দ (রা.) সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা তাঁর পুত্র হযরত নু'মান বশীর (রা.) বর্ণনা করেছেন। তার নাম ছিল নু'মান বিন বশীর, তিনি বলেন, তার পিতা তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসেন আর বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! **আমি আমার এ পুত্রকে আমার এক ক্রীতদাস (উপহার) দিয়েছি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেক ছেলেকে একইভাবে (উপহার দিয়েছ)? তিনি উত্তরে বলেন, না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে তার কাছ থেকে তা ফেরত নাও।** **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল হিবাহ্, বাব আলহিবাতু লিলউলদ, হাদীস নংঃ ২৫৮৬)**

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু সম্পদ দান করেন। (পূর্বেরটিও বুখারীর হাদীস ছিল, আর এটিও)। তখন আমার মা আমরাহ্ বিনতে রওয়াহা বলেন, তুমি মহানবী (সা.)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি (এতে) সম্মত হবো না। আমাকে প্রদত্ত সম্পত্তি বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে সাক্ষী রাখার

উদ্দেশ্যে আমার পিতা মহানবী (সা.)-এর কাছে যান। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানের সাথে সমান ব্যবহার করেছ, অর্থাৎ সবাইকে এতটা সম্পদ বা সম্পত্তি দিয়েছ কি? তিনি উত্তরে বলেন, না। তিনি (সা.) বলেন, খোদাকে ভয় কর আর তোমার সন্তানদের সবার প্রতি সমান ব্যবহার কর। আমার পিতা ফিরে আসেন আর সেই দান ফেরত নেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল হিবাহ্, বাবুল্ আশহাদ ফিল হিবাহ্, হাদীস নং: ২৫৮৭)**

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমাকে সাক্ষী রেখ না, কেননা আমি অন্যায়ের সাক্ষী দেই না। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল হিবাত, বাব কারাহিয়াতু তাফযীল বা'য আওলাদ ফিল হিবাহ্, হাদীস নং: ৪১৮২)**

এই বিষয় বা এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বা এ ধরনের হেবার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সবিস্তারে খুবই চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা অতি উত্তম পথ নির্দেশনা। তিনি (রা.) বলেন, 'আমি মনে করি মহানবী (সা.)-এর এ নির্দেশনা মূল্যবান জিনিসপত্র সম্পর্কে, ছোটখাট জিনিস সম্পর্কে নয়। উদাহরণস্বরূপ, কলা খাওয়ার সময় সামনে উপস্থিত সন্তানকে যদি আমরা কলা দেই আর অন্যরা বঞ্চিত থাকে (এমন ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়)। হাদীসে ঘোড়া বা ধন-সম্পদ অথবা ক্রীতদাসের দৃষ্টান্ত রয়েছে অর্থাৎ কোন মূল্যবান বস্তুর কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) একজনকে বলেন, হয় প্রত্যেক ছেলেকে তার একটি করে ঘোড়া দেয়া উচিত অথবা কাউকেই দেয়া উচিত নয়। তবে এর কারণ হল, আরবদের মাঝে ঘোড়ার মূল্য অনেক বেশি ছিল (অথবা ক্রীতদাসকেও সম্পত্তি গণ্য করা হতো, অথবা অন্যান্য সম্পদ অর্থাৎ যে কোন প্রকার মূল্যবান জিনিস বোঝানো হয়েছে। অতএব, মূল্যবান কোন জিনিস দিতে বারণ করা হয়েছে। আর ঘোড়াও আরবদের কাছে অনেক মূল্যবান জিনিস ছিল)। অতএব, এ নির্দেশ সেসব বস্তু সম্পর্কে যে ক্ষেত্রে পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক সন্তানকে দিলে আর অন্যকে না দিলে পরস্পরের মাঝে মনোমালিন্য দেখা দিতে পারে। তিনি (রা.) বলেন, এ নির্দেশগুলো ছোটখাট জিনিস সম্পর্কে নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মনে কর বাজারে যাওয়ার সময় কোন ছেলে যদি আমাদের সাথে যায়, আর আমরা তাকে দোকান থেকে কোটের কাপড় কিনে করে দেই, তাহলে এটি সম্পূর্ণরূপে বৈধ হবে। এটি বলা যাবে না যে, যতক্ষণ আমরা সবার জন্য কোট কিনে না আনব ততক্ষণ কোন এক সন্তানকে কোটের কাপড় কিনে দেয়া যাবে না। তিনি (রা.) লিখেন, আমাদের বাড়িতে কোন কোন সময় উপহার আসে, তখন যে সন্তান সামনে থাকে, সে বলে, এটি আমাকে দিয়ে দেয়া হোক, আর আমরা সেই উপহার তাকে প্রদান করি। এর অর্থ এটি নয় যে, আমরা অন্যদের বঞ্চিত করি। বরং আমরা মনে করি, আবার কোন উপহার আসলে অন্যজনকে দেয়ার পালা এসে যাবে। অতএব, এ নির্দেশ ছোটখাট জিনিস সম্পর্কে নয়, বরং বড় বা মূল্যবান জিনিস সম্পর্কে, যে ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করলে পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিনি (রা.) বলেন, আমার রীতি হল, আমার কোন সন্তান যৌবনে উপনীত হলে আমি তাকে কিছুটা জমি দিয়ে দেই, যেন সে তা থেকে ওসীয়্যত করতে পারে। (অর্থাৎ, সম্পত্তির মালিক হলে ওসীয়্যত করতে পারবে এবং চাঁদা দিতে পারবে)। এর অর্থ এটি নয় যে, আমি অন্যদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখি। বরং আমি বলি, অন্যরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন তারাও তাদের অংশ পেয়ে যাবে। যাহোক, সেই সম্পত্তি এমন হওয়া উচিত যা বিশেষ গুরুত্ব রাখে না। আর কেউ যদি এমন হেবা করে যার ফলে অন্যদের হৃদয়ে বিদ্বেষ দানা বাধার

আশঙ্কা থাকে তাহলে কুরআনের নির্দেশ হল, সে যেন তা ফেরত নেয় আর আত্মীয়স্বজনের জন্যও আবশ্যক হল, তাকে সেই পাপ থেকে রক্ষা করা।' **(আল্ ফযল, ১৬ এপ্রিল, ১৯৬০, পৃঃ ৫)**

আরেকবার এ ধরনের হেবা সংক্রান্ত একটি বিষয় সামনে আসে। মুফতি সাহেব (রা.) সেটি উপস্থাপন করলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে সম্পত্তির বণ্টন সম্পর্কে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- তা আমাদের দেখতে হবে। পবিত্র কুরআন এমন হেবার কথা উল্লেখ করে নি বরং উত্তরাধিকারের কথা বলেছে, যাতে সকল উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। অনেক সময় মানুষ নিজেদের সম্পত্তি বণ্টন করার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর রাখে না, যার ফলে মামলা-মোকদ্দমা চলতে থাকে আর মনোমালিন্য দেখা দেয়'। এরপর তিনি (রা.) বলেন, 'পবিত্র কুরআনের নির্ধারিত অংশগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কাজেই দেখতে হবে, এসব নির্দেশ ধার্য করার পেছনে কি প্রজ্ঞা রয়েছে। উত্তরাধিকার আইন অনুসারে কেন সব ছেলের সমান অধিকার পাওয়া উচিত। আর এক ছেলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন মহানবী (সা.) তার পিতাকে বলেছেন, হয় তাকেও ঘোড়া ক্রয় করে দাও অন্যথায় অন্যদের কাছ থেকেও ঘোড়া ফেরত নাও। এতে নিহিত প্রজ্ঞা হল, যেভাবে সন্তানের জন্য পিতামাতার আনুগত্য করা আবশ্যক, একইভাবে পিতামাতার জন্যও সন্তানদের সাথে সমান ব্যবহার এবং সমানভাবে ভালোবাসা প্রদর্শন আবশ্যক। কিন্তু পিতামাতা যদি এর অন্যথা করে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার করে, অর্থাৎ যদি একদিকে ঝুঁকে যায়, তাহলে সন্তান হয়ত নিজের অবশ্য পালনীয় দায়িত্বকে অবজ্ঞা করবে না, অর্থাৎ সন্তান হয়ত পিতামাতার প্রাপ্য দিতে থাকবে, কিন্তু সেসব দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ পিতামাতার সেবায় (সে) কোন খুশি ও আনন্দ অনুভব করবে না, বরং সন্তান এটিকে বোঝা মনে করে পালন করবে। অর্থাৎ ঠিক আছে, আল্লাহ্ তা'লা সেবা করতে বলেছেন, তাই করছি। কিন্তু সানন্দে করবে না।'

অনেকে বলেন, কোন কোন মানুষের এমন ব্যবহার সন্তানের জন্য ক্ষতিকর এবং ভালোবাসাকে ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে, যা সন্তানসন্ততি ও পিতামাতার মাঝে হয়ে থাকে। এ জন্য ইসলাম এটি করতে বারণ করেছে। কিন্তু যে ওসীয়্যত ও হেবা সন্তানের জন্য হয় না, বরং ধর্মের জন্য হয়ে থাকে- (তা) বৈধ। সন্তানসন্ততি বা বৈধ উত্তরাধিকারীদের বাদ দিয়ে মানুষ এরূপ হেবা বা ওসীয়্যত করতে পারে কেননা সে নিজেও সেই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত থাকে। শুধু সন্তানসন্ততিরই ক্ষতি হয় না, বরং সে ব্যক্তি নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় হয় তাই সন্তানসন্ততিও মর্মাহত হয় না বা কষ্ট পায় না। কিন্তু যদি হেবা বা ওসীয়্যত কোন বিশেষ সন্তানের নামে করা হয় তাহলে তা অবৈধ হবে। এতে একটি বোঝার বিষয় হল, একটি দায়িত্ব হয় সাময়িক, যা পালন করা আবশ্যক। এর দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝতে পারেন, ধরুন একজনের চারটি ছেলে রয়েছে। সে সবচেয়ে বড় ছেলেকে এমএ পর্যন্ত পড়িয়েছে। আর অন্যরা প্রাথমিক শ্রেণিতে লেখাপড়া করার সময়ই তার চাকরি চলে যায় বা উপার্জন কমে যায়, যার ফলে ছোট সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এই আপত্তি করা যাবে না যে, সে বড় ছেলের বেলায় পক্ষপাতিত্ব করেছে, বরং এটি তো একটি দৈবক্রম। অর্থাৎ তার চেষ্টা ছিল, প্রথমে বড় ছেলেকে লেখাপড়া করাব, এরপর অন্যদেরকে পালাক্রমে এমএ পর্যন্ত পড়াব বা যে পর্যন্ত তারা পড়তে পারে পড়াব। অর্থাৎ, সাময়িক প্রয়োজনের নিরিখে সে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। (সদিচ্ছায় ঘাটতি ছিল না)। অর্থাৎ, এখন এই কাজটি করে নেই, যখন দ্বিতীয় জনের পালা আসবে তখন তা-ও করব,

কিন্তু এরপর পরিস্থিতি পাল্টে যায় আর সে নিজের বাসনা পূর্ণ করতে পারে নি। কিন্তু এর বিপরীতে যদি কোন পিতা নিজের বড় ছেলেকে, যার নিজেরও পরিবার এবং সন্তানসন্ততি রয়েছে, (তাকে) দু'হাজার টাকা দিয়ে এই বলে পৃথক করে দেয় যে, তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য কর। কিন্তু যখন অন্য ছেলেদের ঘরে সন্তানসন্ততি হয় তখন তাদেরকে যদি কিছুই না দেয় তাহলে এটি অবৈধ এবং বৈষম্যমূলক আচরণ হবে। যাহোক, এই ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়টি হেবা বা বিশেষ সম্পত্তির সাথে সম্পর্ক রাখে, যা সম্পত্তি বণ্টন বা হেবা করার সময় বা ওসীয়্যত করার সময় সবার সামনে রাখা উচিত। **(ফরমুদাত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আয সৈয়্যদ শামসুল হক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্, পৃঃ ৩১৬-৩১৭)**

হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) (অর্থাৎ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে), তার মেয়ে বর্ণনা করেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমার মা আমরাহ্ বিনতে রওয়াহা আমার আঁচলে কিছু খেজুর দিয়ে বলেন, হে আমার কন্যা! এগুলো তোমার পিতা এবং মামাকে দিয়ে আস, আর বলবে, এ হল তোমাদের সকালের নাশতা। তার মেয়ে বলেন, আমি খেজুরগুলো নিয়ে নিজের পিতা এবং মামার সন্ধানে বের হই এবং মহানবী (সা.)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে বালিকা! তোমার কাছে এগুলো কী? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এগুলো খেজুর, যা আমার মা আমার পিতা বশীর বিন সা'দ আর মামা আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা'র জন্য পাঠিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, আস, আমাকে দাও। আমি সেই খেজুরগুলো তাঁর (সা.) উভয় হাতে তুলে দেই। মহানবী (সা.) সেই খেজুরগুলো একটি কাপড়ে রাখেন এবং সেগুলোকে অন্য একটি কাপড় দ্বারা ঢেকে দেন। আর একজনকে বলেন, লোকদেরকে খাবারের জন্য ডেকে আনো। অতএব, (তার ডাকে) সকল পরিখা খননকারী সমবেত হয় আর সেই খেজুর খেতে আরম্ভ করে। আর সেই খেজুরগুলো (পরিমাণে) এত বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি পরিখা খননকারীরা খাওয়া শেষ করার পরও তাতে এত বরকত হয় যে, কাপড়ের প্রান্ত টপকে খেজুর নীচে পড়ছিল। **{সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৫৪-৪৫৫, বাব মা যাহারা লিরসূলিল্লাহি (সা.) মিনাল আয়াতি ফি হাফরিল খন্দক, বৈরুতের দারুল হযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকালে দ্বাদশ হিজরীতে হযরত বশীর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)'র সাথে 'আঈনুত্ তামার' এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেন। **{ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪২, বশীর বিন সা'দ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত}**

'আঈনুত্ তামার' কুফার নিকটবর্তী একটি জায়গা। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে দ্বাদশ হিজরীতে মুসলমানরা এই অঞ্চল জয় করে। **(মু'জিমুল বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

সপ্তম হিজরীর যিল কা'দা মাসে মহানবী (সা.) উমরায়ে কাযা'র উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বেই অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আর বশীর বিন সা'দ (রা.)-কে সেগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৩, বশীর বিন সা'দ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত}**

উমরায়ে কাযা'র বিশদ বিবরণ হল, হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির কারণে তখন উমরা করা সম্ভব হয় নি। সন্ধির শর্তগুলোর একটি ছিল মহানবী (সা.) আগামী বছর মক্কায় এসে উমরা করবেন আর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব উমরায়ে কাযা, হাদীস নংঃ ৪২৫২)**

এই দফা অনুযায়ী সপ্তম হিজরীর যুল কা'দা মাসে তিনি (সা.) উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার সংকল্প করেন। আর ঘোষণা দেন, যারা গত বছর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উপস্থিত

ছিলেন তারা সবাই আমার সাথে যাবে। অতএব, যারা খায়বারের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বা স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেছেন তারা ব্যতীত বাকি সবাই এই সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আর কয়েকজনকে অস্ত্রশস্ত্র সহ আগেই প্রেরণ করেন। এখন প্রশ্ন হল, উমরা করার জন্য অস্ত্রের কী প্রয়োজন ছিল? এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা হল, মক্কাবাসীদের ওপর যেহেতু মহানবী (সা.)-এর আস্থা ছিল না যে, তারা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করবে, তাই তিনি (সা.) যুদ্ধের পুরো প্রস্তুতি সহকারে যান, অর্থাৎ যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল তা নিয়ে যান। আর যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) এক সাহাবী হযরত **আবু যর গিফ্‌ফারী** (রা.)-কে মদীনার শাসক নিযুক্ত করেন। আর দু'হাজার মুসলমানের সাথে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যাদের মাঝে একশ' অশ্বারোহী ছিলেন। কুরবানীর জন্য সাথে ছিল ষাটটি উট। মক্কার অবিশ্বাসীরা যখন জানতে পারে, মহানবী (সা.) অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম নিয়ে মক্কায় আসছেন, তখন তারা যারপরনাই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য তারা কয়েকজনকে **মাররুয যাহরান** পর্যন্ত প্রেরণ করে। মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), যিনি অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন, তার সাথে কুরাইশ দূতরা সাক্ষাৎ করে। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন, মহানবী (সা.) সন্ধির শর্তানুসারে নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করবেন। এটি শুনে কাফিররা আশ্বস্ত হয়। মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে আট মাইল দূরবর্তী ইয়াজায নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন সব অস্ত্রশস্ত্র সেখানেই রেখে দেন এবং বশীর বিন সা'দ (রা.)'র নেতৃত্বে কয়েকজন সাহাবীকে সেসব অস্ত্রের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। একটি তরবারি ছাড়া তিনি নিজের কাছে আর কোন অস্ত্রই রাখেন নি। এরপর সাহাবীদের দলকে সাথে নিয়ে **লাব্বাইক** পড়তে পড়তে তিনি (সা.) হারাম শরীফ অভিমুখে অগ্রসর হন। বলা হয়, মহানবী (সা.) যখন কাবা শরীফের হারামে প্রবেশ করেন তখন অন্তর্দাহের কারণে কিছু কাফিরের জন্য এই দৃশ্য দেখা ছিল অসহনীয়, তাই তারা পাহাড়ে চলে যায়। অর্থাৎ মুসলমানরা এভাবে তওয়াফ করবে এটি দেখা আমাদের জন্য অসহনীয়। কিন্তু কিছু কাফির তাদের পরামর্শসভা দারুন-নাদওয়ায় সমবেত হয় আর সেখানে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত নয়নে একত্ববাদ ও রিসালতের নেশায় বিভোর লোকদের অর্থাৎ মুসলমানদের তওয়াফের দৃশ্য দেখতে থাকে। আর পরস্পর বলাবলি করে যে, এই মুসলমানরা আর কিইবা তওয়াফ করবে, এদেরকে তো ক্ষুধা এবং মদীনার জ্বর পিষ্ট করে রেখেছে। অর্থাৎ এরা দৈহিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। মহানবী (সা.) মসজিদে হারামে পৌঁছে ইযতিবা' করেন অর্থাৎ এমনভাবে চাদরাবৃত হন যে, তাঁর ডান কাঁধ এবং বাহু খোলা ছিল। আর তিনি (সা.) বলেন, খোদা তার প্রতি স্বীয় কৃপা বর্ষণ করুন যে এই কাফিরদের সামনে নিজের শক্তি প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ কাফিররা যেসব কথা বলছিল তা তাঁর (সা.) কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন কর। এভাবে শক্তি প্রদর্শন করে যেন তোমাদের দুর্বল দেহ দৃষ্টিগোচর না হয়, বরং যেন সুঠাম দেহ প্রতিভাত হয় অথবা প্রশস্ত কাঁধ যেন দেখা যায়। এরপর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে প্রথম তিন তওয়াফে কাঁধ দুলিয়ে দুলিয়ে গর্বের সাথে হাঁটতে হাঁটতে তওয়াফ করেন। আরবী ভাষায় এটিকে বলা হয় **রমল**। অতএব, এই রীতি আজও বলবৎ রয়েছে আর কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। অর্থাৎ কাবা শরীফের প্রত্যেক তওয়াফকারী কাবা শরীফের প্রথম তিন তওয়াফে **রমল** করে। এভাবে হাঁটার এটিই কারণ। **(শরহে যুরকানী আলা মওয়াহেবুদ্ দুনিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৪, ৩১৭, ৩২১-৩২৩, বাব উমরাতুল কাযা, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত), (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৫২৯, বাব উমরাতুল কাযা, বৈরুতের**

দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত), (লুগাতুল হাদীস , ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩, লাহোরের নু'মানী ছাপাখানা থেকে ২০০৫ সালে মুদ্রিত)

মহানবী (সা.) কতবার উমরা করেছেন? এ সম্পর্কে বুখারীতে যে হাদীস রয়েছে তাতে বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, মহানবী (সা.) কতবার উমরা করেছেন? তিনি বলেন, চার বার। হুদায়বিয়ার উমরা যা তিনি যুল কা'দা মাসে করেছেন। সেই উমরা যদিও সম্পন্ন হয় নি কিন্তু এটিকে উমরা গণনা করা হয় কেননা, সেখানে কুরবানী ইত্যাদি করা হয়েছিল আর মাথাও কামানো হয়েছিল। এই কারণে কেউ কেউ এটিকে উমরা হিসেবে গণ্য করেছেন। এরপর বলেন, যখন মুশরিকরা তাকে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে বাঁধা দিয়েছিল এটি হল, প্রথম উমরা। এরপর রয়েছে সেই দ্বিতীয় উমরা যা পরের বছর যুল কা'দায় হয়েছে। প্রথম বছর হুদায়বিয়ার সময় তো উমরা করা সম্ভব হয়নি, শুধু কুরবানী ইত্যাদি করা হয়েছিল যখন তিনি (সা.) তাদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয় উমরা হয়েছে, পরবর্তী বছর যুল কা'দা মাসে। পরবর্তীটি হল, জি'রানার উমরা, যখন তিনি গণিমতের মাল বিতরণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় এগুলো হুনায়েন এর যুদ্ধের গণিমতের মাল ছিল। তখনও তিনি (সা.) উমরা করেছেন। আমি অর্থাৎ বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করেন, তিনি (সা.) কতবার হজ্ব করেছেন? তিনি বলেন, একবারই হজ্ব করেছেন। আর হজ্বের সময়ও উমরা পালন করেছিলেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ বলে চারবার আর কেউ বলে দু'বার উমরা করেছেন। **{সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল উমরাহ্, বাব কাম এ'তেমারুন নবী (সা.) হাদীস নংঃ ১৭৭৮-১৭৭৯}**

হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) প্রথম আনসার ছিলেন যিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র হাতে সকীফাহ্ বনু সা'য়েদার দিন বয়আত করেছিলেন। **{ইসতিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭২-১৭৩, বশীর বিন সা'দ (রা.), বৈরুতের দারুল জলীল থেকে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত}**

সকীফাহ্ বনু সা'য়েদা কী? এ সম্পর্কে লেখা আছে, এটি মদীনায় বনু খাযরাজের বসার জায়গা ছিল। **(মু'জিমুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**। যাহোক, সে যুগের নিরিখে এটি একটি কক্ষ ছিল বা ছাদঢাকা একটি জায়গা ছিল। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর এখানে সকীফাহ্ বনু সা'য়েদায় তাঁর (সা.) স্থলাভিষিক্ত কে হবে-সে প্রসঙ্গে বনু খাযরাজ এর একটি সভা হচ্ছিল। এ সভার সংবাদ হযরত উমর (রা.)-কে দেয়া হয় আর একইসাথে বলা হয়, কোথাও মুনাফিক এবং আনসারদের কারণে কোন নৈরাজ্য আবার ছড়িয়ে না পড়ে! তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে হযরত উমর ফারুক (রা.) সকীফাহ্ বনু সা'য়েদায় পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে জানা যায়, বনু খাযরাজ খিলাফতের দাবিদার আর বনু অওস এর বিরোধিতা করছে। এদের উভয়টি ছিল মদীনার আনসার গোত্র। এমন সময় একজন আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর একটি উক্তি স্মরণ করান যে, শাসক কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে, যা সেই বিতর্ক চলাকালে বেশিরভাগ মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। আনসাররা তাদের দাবি প্রত্যাহার করে নেন। আর সবাই তাৎক্ষণিকভাবে খলীফা হিসেবে আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তিন দিন পর্যন্ত এই ঘোষণা করা অব্যাহত রাখেন যে, আপনারা সকীফা বনু সা'য়েদায় কৃত বয়আতের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, যদি কারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বলতে পারে। কিন্তু কেউ কোন আপত্তি করে নি। এটি একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি যা ডক্টর হামীদুল্লাহ্‌র পুস্তক থেকে সংগৃহীত। **(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৬৮, আমর সকীফাহ্ নবু সা'য়েদাহ্, বৈরুতের দ্বার ইবনে হাযম থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত), {ডক্টর মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্ রচিত ও অধ্যাপক খালেদ পারভেজ অনুদিত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি হুকমারানী ও জানিশীনী, পৃঃ ১৫৫-১৫৬, লাহোরের রহমানীয়া ছাপাখানা থেকে ২০০৬ সালে মুদ্রিত)**

কিন্তু এর আরো একটি বিশদ বিবরণ রয়েছে তাহল,

(সকীফাহ্ বনু সা'য়েদার) পুরো ঘটনা যখন ঘটে। নিজেদের মাঝে বৈঠক হচ্ছিল, মুনাফিকরা আনসারদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করছিল, তখন হযরত উমর (রা.)'র সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সেখানে পৌঁছার পর আনসাররা পুনরায় তার (রা.) সামনে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও নিজের মতামত প্রকাশ করেন। এই পুরো কার্যক্রম থেকে এটি অনুমেয় যে, আনসার ও মুহাজির সবাই ইসলামের স্বার্থেই চিন্তা করছিল। মুনাফিকরা নৈরাজ্য সৃষ্টির কথাই ভাবছিল। কিন্তু আনসার মু'মিনরা কল্যাণের কথাই চিন্তাই করছিল, অর্থাৎ খিলাফত এবং ইমামত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, তা তিনি আনসারদের মধ্য থেকেই হোন বা মুহাজিরদের মধ্য থেকেই হোন না কেন। আর মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তারা চাইতেন যেন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই তাদের পরম বাসনা ছিল। আর তারা একদিনও জামাত এবং আমীর ছাড়া অতিবাহিত করা পছন্দ করতেন না। যেমন- একটি মত ছিল, আনসারদের মধ্য থেকে আমীর হোক। আর দ্বিতীয় মত ছিল, মুহাজিরদের মধ্য থেকে আমীর নিযুক্ত হোক; কেননা আরবরা তাদের ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব মেনে নিবে না। এ ছাড়া তৃতীয় মতামতও ছিল যে, দু'জন আমীর হোক। অর্থাৎ একজন আনসারদের মধ্য থেকে আর একজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে। এ পর্যায়ে মুহাজিররা আনসারদের একথাও বলে যে, এখন কুরাইশদের মধ্য থেকেই আমীর নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। কাজেই, তারা তাদের অবস্থানের পক্ষে মহানবী (সা.)-এর পর কুরাইশদের মাঝে ইমামত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত তাঁর (সা.) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীও উপস্থাপন করেন, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, اَلْاَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش। অর্থাৎ **ইমাম কুরাইশদের মধ্য থেকে হবে**। **(সীরাতুল হালবিয়াহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৪-৫০৬, বাব ইউযকারু ফীহে মুদ্দাতুম মারাযিহ্, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) আনসারদের সম্বোধন করে বলেন, হে মদীনার আনসারগণ! তোমরা হলে সেসব মানুষ, যারা ধর্মের সেবার জন্য সবচেয়ে বেশি আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলে। এখন তোমরা সর্বপ্রথম এর পরিবর্তনকারী বা বিকৃতকারী হয়ো না, আর এ কথা বলো না যে, আমীর আনসারদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত বা উভয় পক্ষ থেকে হওয়া উচিত। আনসাররা এই বস্তুনিষ্ঠ বাণীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়, আর তাদের মধ্য থেকে (যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে অর্থাৎ) হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং আনসারদের সম্বোধন করে বলেন, হে আনসাররা, খোদার কসম! যদিও মুশরিকদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় জিহাদের ক্ষেত্রে মুহাজিরদের ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, কিন্তু আমরা এটি করেছি শুধু খোদার সন্তুষ্টি, রসূলের আনুগত্য এবং আত্মসংশোধনের উদ্দেশ্যে। তাই এখন অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘায় মত্ত হওয়া আর ধর্মসেবার বিনিময়ে এমন প্রতিদান প্রত্যাশা করা আমাদের শোভা পায় না যা থেকে পার্থিবতার দুর্গন্ধ আসে। আমাদের পুরস্কার আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে রয়েছে আর তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। মহানবী (সা.) কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাই তারাই খিলাফতের অধিকার রাখে। এমনটি যেন না হয় যে, আমরা তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হব। হে আনসারগণ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর মুহাজিরদের সাথে মতভেদ করো না। এসব কথা বলার পর পুনরায় হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) আনসারদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) পুনরায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। আমি ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি, আর হযরত আবু

বকর (রা.)'র হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেন, আমাদের বয়আত গ্রহণ করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করেন আর বলেন, হে আবু বকর (রা.)! আপনাকে মহানবী (সা.) নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই আপনিই আল্লাহ্‌র খলীফা। আপনি আমাদের সবার মধ্যে মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন, তাই আমরা সবাই আপনার হাতে বয়আত করছি। হযরত উমর (রা.)'র পর হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) বয়আত করেন। এরপর আনসারদের মধ্য থেকে হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) তৎক্ষণাৎ বয়আত করেন। এরপর হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী (রা.) বয়আত করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র হাত ধরে আনসারদের সম্বোধন করেন আর তাদেরকেও হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। এরপর আনসাররাও হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে বয়আত করেন। **(আল্ কামেল ফিত্ তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৩, হাদীসুস সকীফাহ্ ওয়া খিলাফাতু আবী বকর (রা.) ওয়া আরযাহু, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত), (সীরাতুল হালবিয়াহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৬, বাব ইউযকারু ফীহে মুদ্দাতুম মারাযিহ্, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত)**

ইসলামী সাহিত্যে এটি বয়আতে **সকীফাহ্** এবং বয়আতে **খাসাহ্** নামেও সুপরিচিত। **(মুহাম্মদ সোহেল তাকুশ রচিত তারীখুল খুলাফায়ে রাশেদীন, পৃঃ ২২, ৩৬৭, বৈরুতের দারুন নাফায়েস থেকে ২০১১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু মাসঊদ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমরা হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.)'র বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন। হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্ন হল, আমরা কীভাবে দরূদ প্রেরণ করব? বর্ণনাকারী বলেন, এই প্রশ্ন শুনে মহানবী (সা.) দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন। আমাদের মনে হল, সে প্রশ্ন না করলেই ভালো হতো। কিন্তু এরপর মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা বল,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা ফিল আ'লামীন ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ) আর সালাম কীভাবে করতে হয় তা তোমরা জান। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সালাত, বাব আস্‌সালাতু আলান্ নবীয়ে (সা.) বা'দুত্ তাশাহ্হুদ, হাদীস নংঃ ৯০৭)**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

আজকের মত সাহাবীদের স্মৃতিচারণ এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে। একটি দোয়ার এলান করতে চাই। সম্প্রতি বাংলাদেশে জলসার প্রস্তুতিমূলক আয়োজন চলছিল। এবার নতুন জায়গায় জলসা হওয়ার কথা ছিল, তাদের এক শহর আহমদনগরে। (নামধারী) আলেম-উলামা এবং বিরোধীরা অনেক হৈচৈ করেছে। প্রথমে তারা সরকারের কাছে জলসা বন্ধ করার দাবি উত্থাপন করে। সরকার তাদের দাবি না মানলে, দাঙ্গাবাজরা আহমদীদের বাড়িঘর এবং দোকানপাটে হামলা করে। কয়েকটি বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করে আর কিছু দোকান জ্বালিয়ে দেয় এবং লুটপাট করে। কয়েকজন আহমদী আহতও হয়েছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন সেখানকার পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনেন। আহতদের আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত ও পূর্ণ

আরোগ্য দান করুন, তাদের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করুন, আর ভবিষ্যতে যখনই জলসার তারিখ নির্ধারিত হয় তারা যেন নিরাপদে জলসা করতে পারে।

নামাযের পর আমি একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি পাকিস্তানের দুনিয়াপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয়া সিদ্দীকা বেগম সাহেবার। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামে (কর্মরত) মুবাল্লিগ ইনচার্জ লাঈক আহমদ মুশতাক সাহেবের মা এবং শেখ মুযাফ্ফর আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ১লা ফেব্রুয়ারি ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে আহমদীয়াতের আগমন ঘটে তার দাদা মোহতরম শেখ মুহাম্মদ সুলতান সাহেবের মাধ্যমে। যিনি ১৮৯৭ সনে ২৪ বছর বয়সে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। মরহুমার বিয়ে হয় ৬৪ সনের ২৯ আগস্টে। তিনি একজন আদর্শ পত্নীর মতো পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। স্বল্প উপার্জনের মাঝে সাদাসিধে জীবনযাপন করে কেবল নিজের বড় পরিবারেরই লালন পালন করেন নি বরং নিজের দেবর এবং ননদদের বিয়েও দিয়েছেন। সর্বদা নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর অপরের স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দিতেন। নামায-রোযায় অভ্যস্ত, দোয়াগো, বিনয়ী, মিশুক, সহজ-সরল, দরিদ্রদের লালন-পালনকারী, পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। নিয়মিত কুরআন পাঠ করতেন। বহু আহমদী ও অআহমদী শিশুদের পবিত্র কুরআন নাযেরা পড়ানো সৌভাগ্য লাভ করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল তার। নিজ খরচে হাফেয ডেকে নিজের এক কন্যা এবং দু'পুত্রকে কুরআন শরীফ হিফয করিয়েছেন।

দুনিয়াপুর জামাতে লাজনার প্রেসিডেন্ট ছাড়াও সেক্রেটারী মাল এবং ইশায়াত হিসেবেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। খিলাফতের প্রতি গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মরহুমা মূসী ছিলেন। তিনি তার পরিবারে স্বামী, দু'কন্যা এবং পাঁচজন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তার দুই পুত্র ওয়াক্ফে যিন্দেগী, যেমনটি আমি বলেছি, তাদের একজন হলেন, লাঈক আহমদ মুশতাক সাহেব, যিনি দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামে মুবাল্লিগ ইনচার্য হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। মায়ের মৃত্যুর সময় তিনি পাকিস্তানে যেতে পারেন নি। মরহুমার দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ ওয়ালীদ আহমদও জামাতের মুরব্বী। তিনিও পাকিস্তানে আছেন এবং সেখানে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। তার এক জামাতা মুযাফ্ফর আহমদ খালেদ সাহেবও জামাতের মুরব্বী, যিনি পাকিস্তানের রাবওয়ায় কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানদেরকে মায়ের সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন, তাদের পক্ষে মরহুমার দোয়া সমূহ কবুল করুন। (আমীন)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮ থেকে ১৪ মার্চ, ২০১৯, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)